নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, নবম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

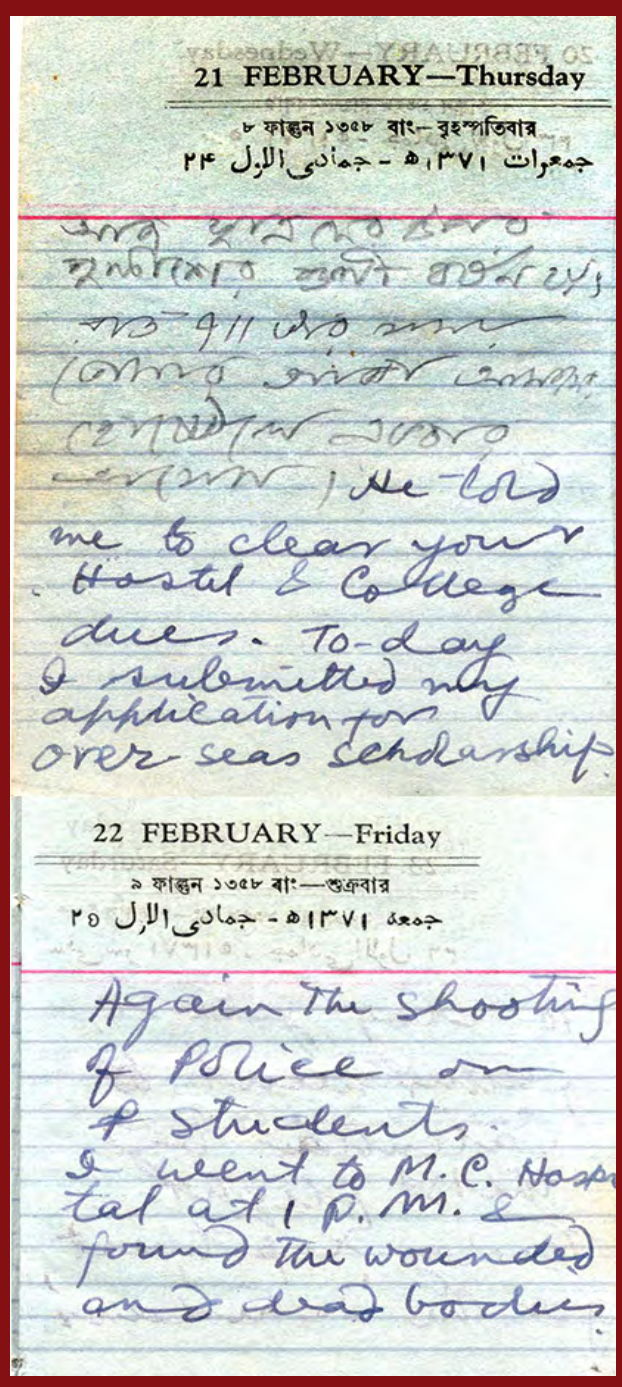

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্বলিত তৎকালীন কলেজ ছাত্র নজরুল ইসলাম-এর ডায়েরি। পরবর্তীতে প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

দাতা - হাজেরা নজরুল

শহিদ প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম

মানবিক নীতিমালা : আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কর্মকাণ্ডের ৫০ বছর, সুইজারল্যান্ড-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'মানবিক নীতিমালা' ঘিরে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। এই নীতিমালার ভিত্তি যে মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে। এই অন্তবাক্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'মানবিক নীতিমালা: এখানে এবং এখন' শীর্ষক মাসব্যাপী প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে সুইস মিনিস্ট্রি অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস, ফটো এলিজে, লোজান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোববার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

গত ২৫ জানুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি শুয়ার্ড, বাংলাদেশে আইসিআরসি প্রতিনিধি দলের প্রধান কাটজা লরেঞ্জ এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি মফিদুল হক-সহ সুইস দূতাবাস, আইসিআরসি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন; 'বিশ্বে প্রতিদিন জলবায়ু সঙ্কটসহ একাধিক কারণে মানুষ বসত-ভিটা হারাচ্ছে, দুঃখ-দুর্দশায় পড়ছে। আমাদের প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গারা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে এখন বাস্তুচ্যুত। বাংলাদেশ মানবিক কারণে ১১ মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু বিশ্বনেতারা এই সঙ্কট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যা বিশ্ব নেতাদের জন্য লজ্জার। এই প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে মানবতার জন্য কাজ করার মানসিকতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি শুয়ার্ড বলেন, 'মানবিক নীতিগুলো সুইস জনগণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এবং এই অসামান্য মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতেই মূলত ১৯৭০ সালের গোড়ার দিক থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।' তিনি আরও বলেন, সুইজারল্যান্ড এবং বাংলাদেশ যখন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন করছে, তখন যৌভাবে আয়োজিত এই প্রদর্শনী *৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন*

গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ স্মরণানুষ্ঠান

২৪ জানুয়ারি ২০২২

"গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সুর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়..."

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মঞ্চে আবৃত্তি শিল্পী রফিকুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন কবি শামসুর রহমান রচিত 'আসাদের শার্ট' কবিতা। অডিটোরিয়ামে উপস্থিত বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। দিনটি ২৪ জানুয়ারি ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মরণ করছে উত্তাল উনসত্তরের জানুয়ারি মাস, যে মাসে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন রূপ নিয়েছিল গণআন্দোলনে, আর সেই গণআন্দোলন পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থানে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর যে শিশু-কিশোররা বেড়ে উঠছে তাদেরকে সেই উত্তাল দিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে প্রতিবছরের মতো এবারও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ স্মরণানুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী উপস্থিত শিশু-কিশোররে উদ্দেশ্যে বলেন,

"৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যার সুদুর প্রসারী ফলাফল বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। এ যাত্রা শুরু ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি প্রণয়ন ও পেশ করার মাধ্যমে, যার চূড়ান্ত ফলাফল আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৬৯-এর ২০-২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মনে করে যে, তরুণ প্রজন্ম যাদের জন্ম ৭১-এর পরে তাদের এই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠ করা দরকার। ৬ দফা, যার চূড়ান্ত ফলাফল জানুয়ারির ২০ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে ১১ দফা দাবি করেছিল তার ২ নম্বর দাবিতে ৬ দফার দাবিগুলো পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পাশাপাশি ছিল ছাত্র সমাজের দাবি, কৃষক সমাজের দাবি, এমনকি জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবি। পাকিস্তানের শাসক সেনাবাহিনীর প্রধান লৌহমানব আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা *৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন*

মুক্তিযুদ্ধে নদী ও নদীর গান: ব্যতিক্রমী আয়োজন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শতদিনের উৎসবের অংশ হিসেবে ২৯ জানুয়ারি ২০২২ শনিবার বিকাল তিনটায় নদী বিষয়ক সংগঠন রিভার বাংলা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)-এর যৌথ উদ্যোগে 'মুক্তিযুদ্ধে নদী ও নদীর গান' শিরোনামে প্রদর্শনী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রিভার বাংলা'র সমন্বয়ক ফয়সাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডো শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক ও নৌ কমান্ডো ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ নিবন্ধ উপস্থাপন করেন আরডিআরসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক তার ভাষণে বলেন, "মৃত্যু জেনেও সবরকম ঝুঁকির মোকাবিলা করে শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করতে নেমেছি কিন্তু সাধারণত আমাদের নিয়ে আলোচনা হয় কম। যে নদী আমাদের জয়লাভে সহায়তা করেছে। সেই নদীও হারিয়ে যাচ্ছে এটা দুঃখজনক। যারা নদী রক্ষার আন্দোলন করছে সেই ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।"

একাত্তরে দেশে ১২৭৪টি এবং এখন মাত্র ৭০০টি নদী বেঁচে আছে উল্লেখ করে

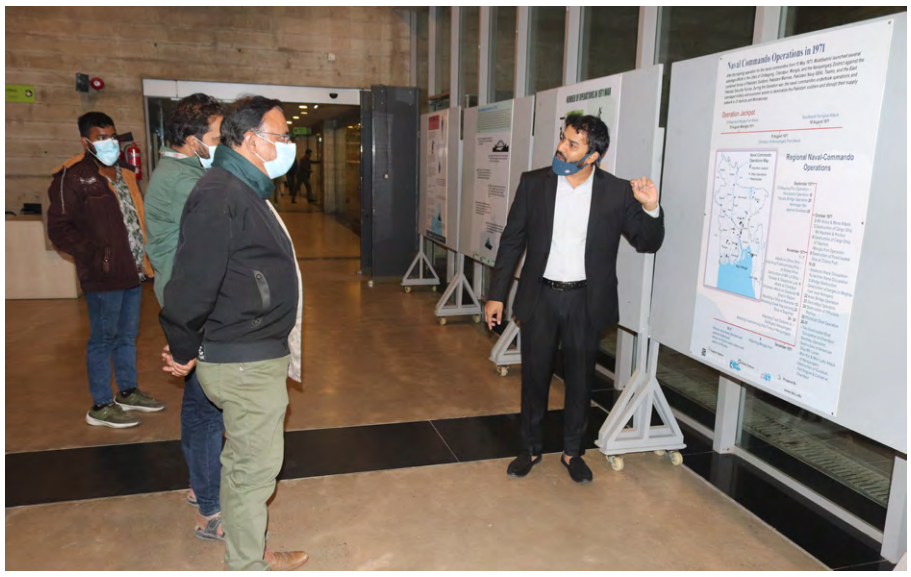

আরডিআরসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ঐতিহাসিক যুগ থেকে নদী আমাদের নানাভাবে সহায়তা করেছে। তিনি বলেন, নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আমরা চাই নদীকে মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করা হোক।

বিদেশি শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে এবং নিজেদের আক্রমণে ভৌগোলিক সুবিধা প্রদান করে নদী হয়ে ওঠে আমাদের পরম মিত্র। নদীগুলি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজতর করেছে এবং বিদেশিদের এই ভূমিতে আকৃষ্ট করেছে। ঐতিহাসিকভাবে নদী বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধের সময় নদী মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলগতভাবে সাহায্য করেছিল কারণ নদী যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। উপরন্তু, মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করার জন্য নদীকে একটি কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। নৌকমান্ডোদের আক্রমণের ফলে মুক্তিযুদ্ধের গতি বেগবান হয়। বিশ্ববাসী স্পষ্ট জানতে পারে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। নদীর পরিবেশ, এর অবস্থান, গতি বা স্রোত, প্রবহমানতা ইত্যাদি কৌশল হিসেবে প্রযোজ্য ছিল একাত্তরে। বর্ষা মৌসুম এবং অব্যবহিত পরে, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল। কারণ ১০ নম্বর সেক্টরের নেতৃত্বে ৭৮টি নৌ-কমান্ডো অপারেশন ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়। একাত্তরে সেক্টর গঠনের সীমানা নির্ধারণে ভৌগোলিক কারণে বড় প্রভাব ফেলেছিল নদী। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় অধিকাংশ সেক্টরের সীমানা তৈরি করে নদীগুলো।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও লেখক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষাকৃত কম আলোকপাত করা বিষয় 'মুক্তিযুদ্ধে নদীর ভূমিকা' সম্পর্কে তথ্যবহুল পরিসংখ্যান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উপস্থাপন করেন আলোচকবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান পরিবেশন করেন বাউল ভজন ক্ষ্যাপা ও তার দল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধে নদীর অবদান ও এ সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত দর্শক ও অংশগ্রহণকারীরা তা আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বাপা সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, নদী গবেষক জাকারিয়া মন্ডল, বাপা নেতা ইবনুল সাঈদ রানা, নোঙর সভাপতি সুমন সামস্, আহসান রনি, মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম জুলফিকার, কথা শিল্পী মনি হায়দার, কবি সঞ্জয় ঘোষ, গল্পকার সাংবাদিক সাইফ বরকতুল্লা, সামস্ সাইদ, কবি গিরিস গৈরিক, লেখক মোজাম্মেল হোসেন নিয়োগী প্রমুখ।

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চোখে বাংলাদেশ

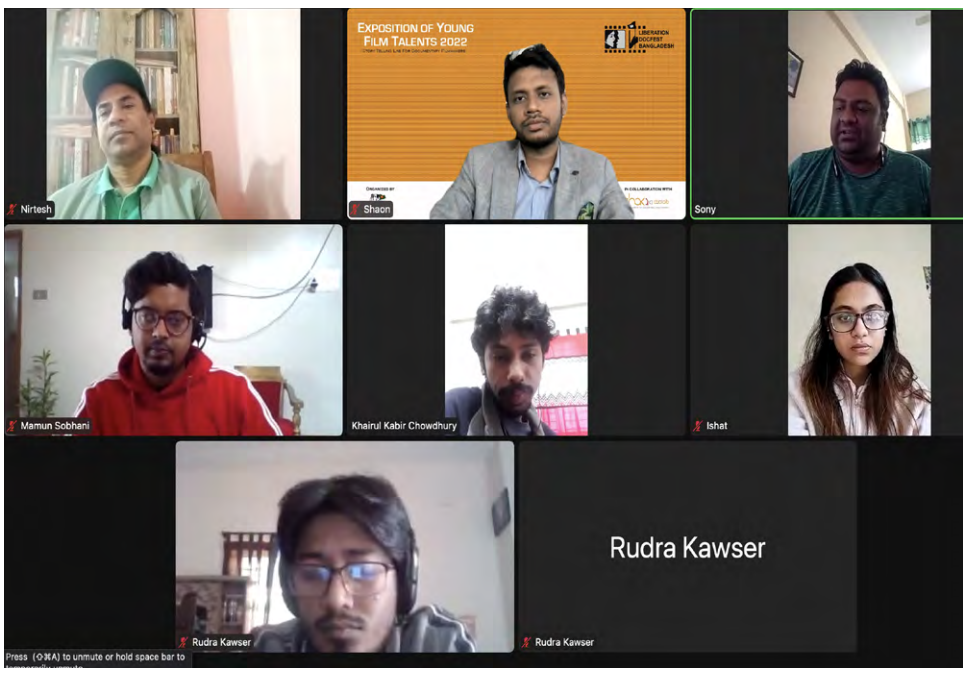

শরিফুল ইসলাম শাওন
উৎসব প্রোগ্রামার, ডকফেস্ট

নির্মাতারা নতুনভাবে উপস্থাপন করেন নিজেদের গল্প এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা অন্যের গল্পকে দৃশ্যমান করেন। দেশের তরুণ নির্মাতাদের চলচ্চিত্র নির্মাণ বিশেষত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ সহায়তার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণও প্রদান করে আসছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস' শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবছর 'এক্সপজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২২'-এ প্রামাণ্যচিত্রের আইডিয়া আহ্বান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারাদেশ থেকে প্রায় শতাধিক আইডিয়া জমা দেন দেশের উঠতি নির্মাতারা। সেখান থেকে ২৫টি আইডিয়াকে প্রথম পর্বের কর্মশালার জন্য নির্বাচন করা হয় ।

১৮ জানুয়ারি ২০২২ থেকে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী অনলাইন কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ঢাকা ডক ল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা এন রাশেদ চৌধুরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা এলিজাবেথ ডি কস্টা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমদ।

নির্বাচিত ২৫টি প্রামাণ্যচিত্রের আইডিয়াকে চার দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক সেশন এবং গ্রুপভিত্তিক সেশনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন প্রশিক্ষকবৃন্দ। কর্মশালার শেষদিন আইডিয়া পিচ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতারা, পিচিং সেশনে প্রশিক্ষকবৃন্দদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি মফিদুল হক। সেখান থেকে সকলের মতামতের ভিত্তিতে ১৫ প্রজেক্টকে মূল ওয়ার্কশপের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাদের প্রজেক্টগুলো হলো–

গারো পাহাড়ে একাত্তর-অরুণাভ দাস, বিউটি অফ হারভেস্ট-মো. আল হাসিব খান আনন্দ, কার্স টুওয়ার্ডস ঢাকা- মাঈশা মালিহা মৌ ইবতেশাম, নাজমার দিনলিপি- এস এম মনোয়ার জাহান রনি, রিবার্থ : পেইন অব হ্যাপিনেস-ফারহানা ইসলাম, ভোঁদড় মাঝির ইতিকথা- সামছুল ইসলাম স্বপন, বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা- মো. রাশিদুল ইসলাম (রাশেদ মানিক), লেঠেল- রাসেল রানা (দোজা), নওগাঁ ১৯৭১- নাসরুল্লাহ মানসুর রাসু, জগৎজ্যোতি- রুদ্র কাওসার, ভগ-পুলকের কথকতা- লাবনী আশরাফি, জঞ্জাল- মো: মাসউদুর রহমান, য়ুকমা (ত্রিপুরা ফ্রিডম ফাইটার্স: দ্যা আনসাং হিরোস)- চেথুওয়াং ত্রিপুরা, পানকৌড়ি-শেখ সাফি আবু জাফর মো. সালেহ (জাফর মুহাম্মদ), স্মৃতিবাহক- মামুন অর রশীদ।

মার্চ মাসে এই ১৫ জন নির্মাতা তাদের প্রজেক্ট নিয়ে পুনরায় পাঁচদিনের মূল কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন। নির্বাচিত চলচ্চিত্রসমূহ নির্মাণ শেষ হলে আমরা দেখতে পাবো তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চোখে বাংলাদেশকে।

Workshop on Memory and Materiality
7 -19 February 2022

ভারতের বেঙ্গালুরুস্থ The Center for Public History at the Srishti Manipal Institute of Art, Design and Technology 'স্মৃতি ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক দুই সপ্তাহব্যপী গণইতিহাস বিষয়ক সপ্তম উইন্টার স্কুল আয়েজন করে, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সপ্তম উইন্টার স্কুল উদ্বোধন হয় এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি ঘটবে। 'গণইতিহাসের আওতায় স্মৃতির তাৎপর্য, বিশেষত অতীতের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততার মধ্যদিয়ে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার সাথে যুক্ত হওয়া' প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছরের উইন্টার স্কুল শুরু হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন মাস্টার ক্লাস, লেকচার সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ভারত, নেপাল, শ্রিলংকা, যুক্তরাজ্য, ইতালী ও পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। ১০ ফেব্রুয়ারি 'অতীতকে ফিরে পাওয়া : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অভিজ্ঞতা' শিরোনামে মফিদুল হক উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষত নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত করানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গৃহিত নানা পদক্ষেপ তিনি তুলে ধরেন। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল ইতিহাসের সঙ্গেই পরিচিত করে তুলছে না তাদেরকে এই ইতিহাসের অংশী করে তুলতে তাদের জন্য মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহের প্রকল্পও গ্রহণ করেছে। যে প্রকল্পের আওতায় এ প্রজন্মের একজন শিক্ষার্থী তার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে শুনছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং তা লিপিবদ্ধ করে শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। আবার সমকালীন রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়েও কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মীরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা।

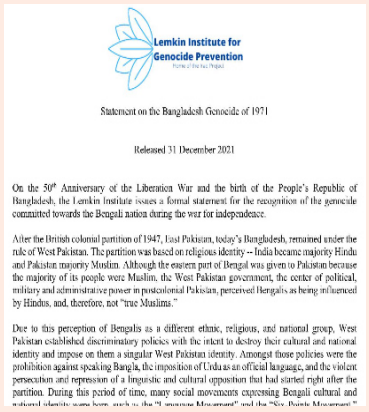
Lemkin Institute for Genocide Prevention

Statement on the Bangladesh Genocide of 1971

Released 31 December 2021

On the 50th Anniversary of the Liberation War and the birth of the People's Republic of Bangladesh, the Lemkin Institute issues a formal statement for the recognition of the genocide committed towards the Bengali nation during the war for independence.

After the British colonial partition of 1947, East Pakistan, today's Bangladesh, remained under the rule of West Pakistan. The partition was based on religious identity -- India became majority Hindu and Pakistan majority Muslim. Although the eastern part of Bengal was given to Pakistan because the majority of its people were Muslim, the West Pakistan government, the center of political, military and administrative power in postcolonial Pakistan, perceived Bengalis as being influenced by Hindus, and, therefore, not "true Muslims."

Due to this perception of Bengalis as a different ethnic, religious, and national group, West Pakistan established discriminatory policies with the intent to destroy their cultural and national identity and impose on them a singular West Pakistan identity. Amongst those policies were the prohibition against speaking Bangla, the imposition of Urdu as an official language, and the violent persecution and repression of a linguistic and cultural opposition that had started right after the partition. During this period of time, many social movements expressing Bengali cultural and

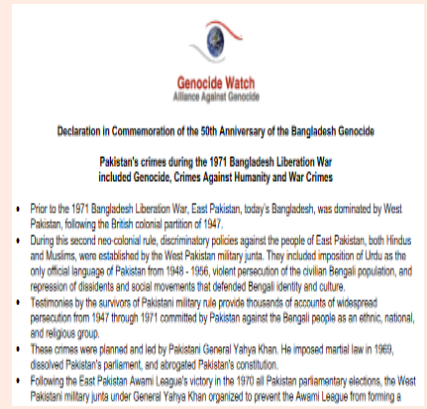
Genocide Watch
Alliance Against Genocide

Declaration in Commemoration of the 50th Anniversary of the Bangladesh Genocide

Pakistan's crimes during the 1971 Bangladesh Liberation War included Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes

- Prior to the 1971 Bangladesh Liberation War, East Pakistan, today's Bangladesh, was dominated by West Pakistan, following the British colonial partition of 1947.
- During this second neo-colonial rule, discriminatory policies against the people of East Pakistan, both Hindus and Muslims, were established by the West Pakistan military junta. They included imposition of Urdu as the only official language of Pakistan from 1948 - 1956, violent persecution of the civilian Bengali population, and repression of dissidents and social movements that defended Bengali identity and culture.
- Testimonies by the survivors of Pakistani military rule provide thousands of accounts of widespread persecution from 1947 through 1971 committed by Pakistan against the Bengali people as an ethnic, national, and religious group.
- These crimes were planned and led by Pakistani General Yahya Khan. He imposed martial law in 1969, dissolved Pakistan's parliament, and abrogated Pakistan's constitution.
- Following the East Pakistan Awami League's victory in the 1970 all Pakistan parliamentary elections, the West Pakistani military junta under General Yahya Khan organized to prevent the Awami League from forming a

বাংলাদেশ জেনোসাইড: লেমকিন ইন্সটিটিউট এবং জেনোসাইড ওয়াচ-এর স্বীকৃতি প্রদান

লেমকিন ইন্সটিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন এবং জেনোসাইড ওয়াচ তাদের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুটি পৃথক বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা যে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল তাকে জেনোসাইড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে লেমকিন ইন্সটিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতির ওপর সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। একইভাবে জেনোসাইড ওয়াচ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছাড়া দুটি সংস্থাই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

জেনোসাইড প্রতিরোধ এবং পূর্ববর্তী জেনোসাইডের স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে লেমকিন ইন্সটিটিউট এবং জেনোসাইড ওয়াচ-এর এই কর্মকাণ্ডকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশেষভাব স্বাগত জানায়।

হাসান মাহমুদ অয়ন, সিএসজিজে ডেস্ক

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং উত্তম কুন্ডু ও টুম্পা কুন্ডু

কোভিড ১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউ কাটিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে পাঠদান সবে শুরু হলে আমাদের উপর ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে মাগুরা জেলায়। ইতিপূর্বে ২০১৪ সালে প্রথমবার মাগুরা জেলায় সংক্ষিপ্তভাবে এই শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল বলে কিছুটা পরিচিতি ছিল। দীর্ঘ সাত বছর বিরতির পর আবার পুরাতন সুহৃদের সাথে যোগাযোগ করে কয়েকজনকে পাওয়া গেল, জানানো হয় পুনরায় আসছি। এছাড়া আরেক সুহৃদ উত্তম কুন্ডুকে জানানো হয় আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সকালের বাসে অফিসের কাজে মাগুরায় আসব। প্রাক যোগাযোগের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে মাগুরায় যাই। বাস থেকে নেমে দেখি বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে উত্তম কুন্ডু দাঁড়িয়ে আছেন। কুশল বিনিময়ের পর সোজা নিয়ে গেলেন বাসায়।

উত্তম কুন্ডু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এক পরম সুহৃদ। তার সাথে পরিচয় ২০২০-এর নভেম্বরে, যখন ব্যক্তিগত কাজে ঝটিকা সফরে মাগুরায় এসেছিলাম। ঘণ্টা তিনেক আলাপচারিতার পর থেকে তার সাথে পথচলা। এই পথচলা আরও নিবিড় হয় সেপ্টেম্বর ২০২১ মাগুরায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়। ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে এক কথায় বাধ্য হয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে তার বাসায় যেতে হলো। দুপুরের আহারের পর প্রশাসনিক যোগাযোগ পর্ব শেষ করে পুনরায় ফিরে আসতে হল। সন্ধ্যার চা চক্রের সময় আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে মাগুরায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজের বিষয়ে জেনে নিলেন। আমিও তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নিই মাগুরার সার্বিক পরিস্থিতি এবং মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসহ অনেক বিষয়। আলাপচারিতার মধ্যে পরিচিত হলাম দাদার মেয়ে টুম্পা কুন্ডু ও ছেলে শোভন কুন্ডুর সাথে। এরই মধ্যে এসে যোগ দিলেন দাদার মেজো ভাই। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলাতেই তিনি বললেন, তারাও শরণার্থী হয়ে কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। বিদায় নিয়ে চলে আসার পূর্ব মুহূর্তে মেয়ে টুম্পা কুন্ডু জানতে চায় ২০১৪ সালের মত এবারও কী হলুদ রং-এর বাসটি আসবে। সম্মতি দিয়ে জানালাম হ্যাঁ। টুম্পা কুন্ডু জানালো ২০১৪ তাদের স্কুলে এসেছিল (মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর। সে তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। সেদিন তাদের ক্লাসের সবাই মিলে জাদুঘর দেখেছে, হলরুমে মুক্তিযুদ্ধের ছবি দেখে অনেক মজা পেয়েছে। টুম্পা কুন্ডুর কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবলাম এখানেই তো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শক্তি। ইতোপূর্বে ২০১৪ সালে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিক্রমণ সময়ে মাগুরার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে কিছু অবগত ছিলাম। এবার উত্তম কুন্ডুর কাছ থেকে আরও জানা গেল সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঐতিহাসিক নোমানী ময়দান সংলগ্ন আনসার ক্যাম্পে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের কথা, জানা গেল ট্রেজারি থেকে অস্ত্রলুট ও জগন্নাথ দত্তের বাড়ি 'দত্ত বিল্ডিং', রেণুকা ভবন, গোল্ডেন ফার্মেসি দখল নিয়ে ক্যাম্প স্থাপনের কথা। এভাবে তিনি জেলা শহর থেকে উপজেলা সমূহে সড়ক যোগাযোগের পরিকল্পনা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এলাকার নামগুলো সংগ্রহের কাজেও নানাভাবে সহযোগিতা করলেন।

টুম্পা কুন্ডুর কথায় ফিরে আসি। মাগুরায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিন সকাল বেলায় টুম্পা কুন্ডু ফোনে বিনয়ের সাথে জানান ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি শহরতলীর স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো গেলে ওরাও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। একটু চিন্তা করে দেখবেন কাকু। কেননা ২০১৪ সালে মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী বর্তমানে Art & Creative studies বিষয়ে ঢাকা গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আমাকে আবারও ভাবনায় ফেলে দিল। অনুরোধ জানালেন আমাদের প্রজন্মরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, শুধু পাঠ্যবই থেকে কিছু জানতে পারছি তাই সময় পেলে মাগুরা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও শালিখা উপজেলার পাটোখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখানো যায় কি না? ক্ষুদে বন্ধুটির অনুরোধের মধ্যে শালিখা উপজেলার পাটোখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের এই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার উপযোগী না হওয়ায় যেতে পারিনি তবে মাগুরা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কুন্ডু পরিবারের সবার আন্তরিকতায় পনের দিনের মাগুরা জেলায় পথচলায় মনে হয়েছে যেন নিজের এলাকায় অবস্থান করছি। ২২ সেপ্টেম্বর যেখানে উত্তম কুন্ডুর সাথে দেখা হয়েছিল ১১ অক্টোবর মাগুরা থেকে কর্মসূচি শেষ করে ঢাকা ফেরার সময় সেখানেই দাদা হাসিমুখে বিদায় জানালেন। সেই থেকে উত্তম কুন্ডু ও টুম্পা কুন্ডু ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে একইসুত্রে মিশে গেলেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

‘মানবিক নীতিমালা : এখানে এবং এখন’ প্রদর্শনীর অন্দরে

প্রদর্শনীর প্রথম সেকশনে রয়েছে, মানবতা বিষয়ক ১০টি আলোকচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: ফরাসি ভাষী সুইজারল্যান্ডের ১০ জন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে দশটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এই মৌলিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নির্মাতারা একটি নতুন, স্থানীয় ও সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবিক নীতিগুলির প্রভাব নিরীক্ষণ করেছেন। এই সঙ্কটগুলোকে প্রত্যাক্ষভাবে না দেখে দশজন সুইস আলোকচিত্র শিল্পীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেয়া হয়েছে যাতে মানবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মানবিক নীতি প্রতিফলিত এবং চিত্রিত করা হয়। এটি দর্শকদের বিষয়বস্তু এবং চলচ্চিত্রের বার্তা সম্পর্কে চিন্তা করার পাশাপাশি নীতিগুলোর অর্থ এবং নিজ জীবনে এর ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনায় উৎসাহিত করে।

মানবতা বিষয়ক সংলাপ: ‘মানবিক নীতিমালা এখন এবং এখানে’ শীর্ষক প্রদর্শনীতে মানবতা বিষয়ক সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন এইজ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তাঁদের উপযোগী ছয়টি আলোকচিত্র দেখে মানবতা বিষয়ক সংলাপে অংশগ্রহণ করবে। ছবিগুলো দেখার সময়

শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া, চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং ব্যাক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তারপর প্রতিটি ছবির পেছনের গল্প, পরিস্থিতি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আবিষ্কারের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

দ্বিতীয় সেকশনে রয়েছে, মানবিকতায় সুইজারল্যান্ডের ভূমিকা। বিশ্বব্যাপী সুইজারল্যান্ডের মানবিক সম্পৃক্ততা হচ্ছে সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সংঘর্ষজনিত কারণে যে সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সাহায্য ও রক্ষা করা। এই সকল কর্মকাণ্ডে সুইজারল্যান্ড অনুসরণ করে নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা, স্বাধীনতার মর্ম যা সবরকম রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে মুক্ত। বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত ও সামাজিক মর্যাদার ভেদাভেদ না করে সমস্যার শিকার সকলকে সহযোগিতা করে।

বাংলাদেশের প্রতি সুইজারল্যান্ডের সংহতিমূলক কর্মকাণ্ড শুরু হয় ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের সময়, যা ভোলা জেলায় সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছিলো। ব্যাক্তিগত উদ্যোগ, সরকারি তহবিল এবং বিভিন্ন সুইস ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাকে অর্থায়নের মাধ্যমে সুইজারল্যান্ড থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ১২-১৩ নভেম্বর ১৯৭০ ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এ সময় সুইস রেডক্রস প্রায় ১০ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্কের সমপরিমাণ খাদ্য, ওষুধ , বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি জরুরি ভিত্তিতে সুইস বিমান সংস্থা ‘বালাইর’-এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় প্রেরণ করে। মুক্তিযুদ্ধকালে সুইস সরকার জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আইআরসি এবং সুইস রেডক্রসের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা সেবায় ২০ মিলিয়নের বেশি সুইস ফ্রাঙ্ক প্রদান করে।

বিগত ৫০ বছর ধরে সুইজারল্যান্ড মানবিক এবং উন্নয়নমূলক কাজের সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও জরুরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি-হ্রাস, দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি এবং ঝুঁকি সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সুইজারল্যান্ড সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশে আইসিআরসির মানবিক সম্পৃক্ততার অংশবিশেষ রয়েছে তৃতীয় সেকশনে। সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা প্রদানে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে আইসিআরসির কার্যক্রম শুরু হয়। তারা যুদ্ধ বিধস্ত মানুষের মাঝে বিশেষত শিশুদের জন্য ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেছে। বর্তমানে আইসিআরসি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আটক, সশস্ত্র সংঘাত এবং সহিংসতার শিকার কিংবা অন্যান্য পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করছে। বাস্তুচ্যুত ও প্রতিবন্ধী মানুষদের সাহায্য করার জন্য আইসিআরসি এবং বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথভাবে কাজ করছে। সহিংসতার শিকার ব্যাক্তিদের সহায়তা প্রদান, পরিবারের পুনর্মিলনে সহায়তা, পুনর্বাসন ইত্যাদি মানবিক কর্মকাণ্ড আইসিআরসি সম্পাদন করে থাকে। ‘মানবিক নীতিমালা এখানে এবং এখন’ প্রর্দশনীতে ১৯৭১ এবং পরবর্তী সময়ে সাম্প্রতিককালে আইসিআরসি’র মানবিক কার্যক্রমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী জ্যাকব সাওয়ব- এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তাঁর ধারণকৃত আলোকচিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন ও পরবর্তীতে সুইস ও বাঙালি মানবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সংবাদপত্রের কাটিং প্রদর্শিত হয়েছে। জ্যাকব সাওয়ব ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশে এসেছিলেন একজন সহায়তা-কর্মী হিসেবে। সে সময় আইসিআরসিসহ বিভিন্ন সহায়তা কর্মী/সংস্থার কর্মকাণ্ডের ছবি তিনি ক্যামেরাবন্দি করেন।

আমরা আশা করি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্মুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা স্বশরীরে প্রদর্শনীটি দেখবে এবং তাদের জন্য বিশেষায়িত সেকশন মানবতা বিষয়ক সংলাপ- এ অংশগ্রহণ করবে।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সকলকে প্রদর্শনী দেখার এবং কিউআর কোডে স্ক্যান করে মানবতা বিষয়ক সংলাপে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মানবিক নীতিমালা : আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।’

বাংলাদেশে আইসিআরসি প্রতিনিধি দলের প্রধান কাটজা লরেঞ্জ বলেন, ‘১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আইসিআরসি মানবিক সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের পাশে ছিল। আমরা শত-হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সুরক্ষা ও সহায়তা দিয়েছি। সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও আমরা সহায়তা করা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি জানান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সঙ্গে যৌথভাবে আইসিআরসি নানা কারণে ছিন্ন পারিবারিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের বিষয়ে কাজ করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, এই প্রদর্শনী মানবিক ও ব্যক্তিগত আবেগ এবং অনুসন্ধানের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে আইসিআরসি এবং সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে যা আজ অবধি অব্যাহত আছে। বিগত ৫০ বছর ধরে সুইজারল্যান্ড মানবতা এবং উন্নয়ন সহযোগী হয়ে বাংলাদেশের পাশে আছে। এই প্রদর্শনীতে মুক্তিযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোহিঙ্গা সংকটে আইসিআরসি এবং সুইজারল্যান্ডের মানবিক কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র, তথ্য ছাড়াও ইউনিক আলোকচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানবতার ৪টি মূলনীতি মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার অনুভূতি তুলে ধরা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে ‘মানবিক নীতিমালা:এখানে এবং এখন’ প্রদর্শনীর উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ায় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মানবতা ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা হলো মানবিক নীতির মূল ভিত্তি। নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যে মানবিক নীতির তাৎপর্য ও দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্ব তুলে ধরাই এ প্রদর্শনীর লক্ষ্য। ‘মানবিক নীতিমালা: এখানে এবং এখন’ প্রদর্শনী আয়োজনে সহায়তা করায় বাংলাদেশে আইসিআরসি প্রতিনিধি দলের প্রধান কাটজা লরেঞ্জ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি শুয়ার্ড-এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ উল্লেখ করে মফিদুল হক বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ড. আব্দুল মোমেন জাদুঘরের পাশে আছেন, থাকবেন। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির সময় ডা. মো. এনামুর রহমান-এর মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে মফিদুল হক বলেন, রানা প্লাজা ট্রাজেডির সময় ডা. এনামুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীরা যেভাবে আহত-নিহত শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরিশেষে প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উৎসাহে অর্ধশতাধিক প্রদর্শনী

একের পর এক মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানান দিচ্ছেন মৌলভীবাজারের সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক বিকুল চক্রবর্তী। তিনি এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আর এখন পর্যন্ত কয়েক লাখ মানুষ এই প্রদর্শনী দেখেছেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাক্তিবর্গ ও সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীবর্গ তা পরিদর্শন করেন। বিকুল চক্রবর্তী জানান, ২০০৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শুরু করেন তথ্য সংগ্রহ। একই সাথে সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক সংগৃহিত একশতটি ছবি উপহার দেয়া হয় তাকে। এই ছবি ও স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় ছবি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত স্মারক সংগ্রহ করে আয়োজন করেন প্রদর্শনী। প্রথমে ২০০৯ সালে তিনি শ্রীমঙ্গল চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথ মিক বিদ্যালয়ে পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ এমপি। এর পরের বছর প্রদর্শনী করেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশ শহরের টাউন হলে। সেখানে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া ও ত্রিপুরা সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। সেখানেও তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনীটি হাজার হাজার মানুষ পরিদর্শন করেন। এর পর প্রত্যেক বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও মাতৃভাষা

দিবসে তিনি আয়োজন করে আসছেন এ আলোকচিত্র প্রদর্শনী। বিকুল চক্রবর্তী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাকে উৎসাহ না দিলে তিনি কখনই এমন কাজ করতে পারতেন না। তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধের ৯ বছর পর তার জন্ম। বাবার কাছ থেকেই ছোট বেলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতেন। মৌলভীবাজার রাজনগরের অন্তেহরী গ্রামে নিজের বাড়িতেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন তার পিতা বিকাশ চক্রবর্তী। দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যের যোগান। অনেককে কুলাউড়া বর্ডার হয়ে ভারতে পৌঁছে দিয়েছেন। রাজাকাররা খবর পেয়ে হানা দেয় তাদের গ্রামের বাড়িতে। লুট করে তাদের বাড়ি। নির্যাতনের শিকার হন তার বাবার কাকী। বাবার কাছ থেকে এসব গল্প শুনে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির প্রতি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দেয়া প্রশিক্ষণ মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহে তার জন্য বড় উৎসাহ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে শুধু প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেই নয় পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাকে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, প্রাক্তন মহাব্যাস্থাপক মাহবুব আলম, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর সমন্বয়ক রঞ্জন কুমার সিংহ ও ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ নিয়েছেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ততা তাকে যুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে তাগাদা দেয়। সেই লক্ষে তিনি মৌলভীবাজারে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও চিহ্নিত করণের কাজ শুরু করেন। তার এ কাজের ফলে শ্রীমঙ্গল সাধুবার বটতলী বধ্যভূমি একাত্তর সংরক্ষিত হয়। সেখানে স্থাপিত হয় স্মৃতি স্তম্ভ। সংরক্ষিত হয় কমলগঞ্জ দেড়রাছড়া বধ্যভূমি। বিকুল চক্রবর্তী মনে করেন, এই কাজটি তার মননের একটি কাজ। দেশের প্রতি দেশাত্ববোধ থেকেই তিনি এটি করে আসছেন আর তাকে সহায়তা ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বিকুল চক্রবর্তী সর্বশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন শ্রীমঙ্গল থানা ক্যাম্পাসে গত ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবসে এর উদ্বোধন করা হয় এবং শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০২১। থানা ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দেয়া আনেকগুলো ছবি ছিলো। যা প্রদর্শনীটিকে সমৃদ্ধ করে। তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রেরণায় তার সংগৃহিত তথ্য ও স্মারক দিয়ে নিঃসন্ধেহে একটি অ করা সম্ভব।

শোক বার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ অমিয় চক্রবর্ত্তী

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সুঘর নিবাসী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অকৃত্রিম সুহৃদ সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রকৌশলী অমিয় চক্রবর্ত্তী গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। প্রকৌশলী অমিয় চক্রবর্ত্তীর অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। সদ্য প্রয়াত প্রকৌশলী অমিয় চক্রবর্ত্তী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে একটি প্রতীকি ইট কয় করে সহায়তা প্রদান করেন এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ কল্পে সম্পৃক্ত করেছেন। পরোপকারী প্রয়াত প্রকৌশলী অমিয় চক্রবর্ত্তী কথা দিয়েছিলেন মার্চ মাসে আরও তিন বন্ধুকে নিয়ে আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে অনুদান প্রদান করবেন। কিন্তু সে আশা আর পুরণ হলো না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ জোৎস্না আরা বেগম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দীর্ঘ এই চলার পথে এক সুহৃদ মৌলভীবাজার সদর উপজেলার হাফিজা খাতুন মিউনিসিপাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জোৎস্না আরা বেগম। সদা হাস্যজ্বল এই সুহৃদ-এর সাথে প্রথম পরিচয় আগস্ট ২০০৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ে। সেই থেকে পথচলা এবং পথচলাটি আরও নিবিড় হয় ২০১০ সালে তারুণ্যের পদযাত্রার সময়ে। "আমাদের জাদুঘর আমরাই গড়ব" তরুণদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজে উদ্যোগি হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ তহবিলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। জাদুঘরের পরম সুহৃদ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জোৎস্না আরা বেগম ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ কোভিড আক্রান্ত হয়ে ভোর ৫.৩০ মিনিটে ঢাকার রেনেসাঁ হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীর শোক প্রকাশ এবং পরিবারের সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ স্মরণানুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐতিহাসিক মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং এইদিনই জাতির পিতা জেল থেকে মুক্তি পান। তাই, এই গণ-অভ্যুত্থান বাঙালির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। আজ আমরা শুধু ৩০ লক্ষ শহিদকে স্মরণ করব না তার সাথে স্মরণ করব স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে যারা শহিদ হয়েছেন তাদেরকেও।" মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক মনে করেন শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাসের পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ তুলে ধরে তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এই গণ-অভ্যুত্থান একদিনে শুরু হয়নি। আমরা ইংরেজদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করি এবং পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আমরা বাঙালিরা ছিলাম ৫৬% আর ওরা ছিল ৪৪%। বাঙালিদের রক্তদান, ছাত্রদের রক্তদান বৃথা যায়নি। পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের ঠকানো হত, শোষণ করা হত। একটি উদাহরণ দিই পাট, চা ইত্যাদি থেকে আমরা আয় করতাম ৮০% আর ওরা করত ২০% কিন্তু আমরা ভোগ করতে পারতাম মাত্র ১৮% আর ওরা ভোগ করত ৮২% সমান সমান নয়। আমরা উপার্জন করতাম ৮০ টাকা আর পেতাম ২০ টাকা আর তারা উপার্জন করত ২০ টাকা ভোগ করত ৮০ টাকা। এটা ছিল তাদের বর্বরতার চিত্র। আরেকটি উদাহরণ দিই সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈন্য ছিল ৭ ভাগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য ছিল ৯৩ ভাগ অথচ জনসংখ্যায় আমরা বেশি ছিলাম। এভাবে আমাদের ঠকানো হত। কিন্তু ছাত্ররা '৬৯ সালে ১১ দফা দাবি দিয়েছিল যার মধ্যে ৬ দফা পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত ছিল, আরও অনেক কিছু ছিল। এক কথায় এর লক্ষ্য ছিল বাঙালিরা যাতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সেই অধিকার আদায় করা।' বক্তব্যের মাঝে সিকান্দার আবু জাফর রচিত এবং উনসত্তরে আন্দোলন চলাকালে অভিনেতা ও আবৃত্তিশিল্পী গোলাম মুস্তাফার কণ্ঠে পাঠকৃত কবিতা 'বাংলা ছাড়ো' আবৃত্তি করে শোনান আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে স্বভূমি লেখক শিল্পী কেন্দ্রের শিল্পীদের কণ্ঠে গণসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

সম্প্রতি আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভিজ্যুয়াল ভাষ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশত সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এক একটি সাক্ষাৎকারে উঠে আসছে মুক্তিযুদ্ধে অজানা সব তথ্য। এসকল তথ্য পাঠকের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা। প্রথম কিস্তিতে ছাপা হলো এগারো নম্বর সেক্টরের জামালপুর সরিষাবাড়ির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো: আব্দুল মান্নানের ভাষ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে– **জাহিদ আহমদ ও শরীফ রেজা মাহমুদ**

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

আমি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। একাত্তর সালে আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। মার্চের ২৫ তারিখে ক্র্যাকডাউন হল এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা হল তখন থেকেই আমরা ভাবছিলাম কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারি। মে মাসের শেষদিকে আমরা ভারতে গেলাম, সংবাদ পেলাম ওখানে শরণার্থী ক্যাম্প খুলেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করছে। মহেন্দ্রগঞ্জ রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে আমরা যোগদান করলাম। যোগদানের পর ওখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল খাসিয়া সিংগাপাড়া অস্থায়ী ক্যাম্পে। অস্থায়ী ক্যাম্পে আমরা ২২ দিন থাকলাম। সেখানে হাল্কা ট্রেনিং করি, পুলিশের একজন হাবিলদার ছিলেন আয়নোদ্দিন নামে, তিনি আমাদের ট্রেনিং করাতেন। আমাদেরকে ওখানে রাখার কারণ হল তুরায় ফার্স্ট ব্যাচ-প্রথম উইং-এর ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে, যার কারণে আমাদেরকে আর মাঝখান থেকে নিতে পারছে না। জুন মাসের ১২ তারিখে প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শেষে আমাদের ট্রেনিং শুরু হল। আমাদের ট্রেনিং দিলেন বাঙালি সুবেদার পি এন দে আর পাঞ্জাবি কে এল দাশ। আর একজন শিখ ছিলেন তার নামটা ঠিক মনে নাই। ট্রেনিং-এর মধ্যে ছিল, রাইফেল ট্রেনিং, এলএমজি ট্রেনিং, এসএলআর, টু ইঞ্চ মর্টার, রকেট লাঞ্চার ও গ্রেনেড চার্জ করা। এরপর চারদিন জঙ্গল ট্রেনিং। সেখানে চারদিন এক মুষ্টি চাল দিয়ে আমাদের পাঠানো হয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ফয়েল পেপার দিয়ে ছাউনি করে তার নিচে থাকতে হতো।

ট্রেনিং শেষ হলে আামাদেরকে নিয়ে আসা হয় মাইনকার চর। এখানে টাংগাইল থেকে কাদের সিদ্দিকী একজনকে পাঠান, তিনি আমাদের কাছে মুক্তিবাহিনীর উচ্চতর ট্রেনিং প্রাপ্ত কিছু সদস্য চাইছেন। হাফিজ নামের এক লোক এসে আমাদের নিয়ে গেল। আমরা ৫৯ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। তিনটা নৌকা একসাথে স্ট্যার্ট করলাম ঐখান থেকে। সন্ধ্যার দিকে আমরা বাবাসী ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাটের মাঝামাঝির দিকে আসলাম। আমাদেরকে একটা সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে বাবাসী ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাট এই দুইটা জায়গা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা সার্চ লাইট দিয়ে নদীর মধ্যে চেক করে। আমরা একটু সাবধানে যাচ্ছিলাম হঠাৎ ঝড় আসলো, সব অন্ধকার হয়ে গেল। ঝড়ের ভিতর দিয়ে আমরা বাবাসী ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাট অতিক্রম করলাম। পরের দিন আছরের ওয়াক্তে আমরা গাজীপুরের চর গিরিশ উনিয়নের জোড়বাড়ি গ্রামে পৌঁছাই। আমরা সবাই ক্ষুধায় অস্থির, যেহেতু আমাদের চেনা জায়গা, আমাদের কয়েকজনের বাড়ি ঐখানে তখন কমান্ডার সাহেব রাজি হলেন খাবার জন্য সময় দিতে। একটা পরিচিত ছেলেকে নৌকা নিয়ে যেতে দেখলাম। তাকে ডাক দিয়ে কাছে নিয়ে আসলাম। বললাম, আমাদের খুব ক্ষুধা লেগেছে, বেশ কয়েকজন মানুষ আছি আমরা। তুমি মাকে গিয়ে চুপিচুপি গাছের পেয়ারা পেড়ে দিতে বলো আর কাঁঠাল মুড়ি দিতে বলো। দুইটা কাঁঠাল, এক টিন মুড়ি আর এক ঝাঁপি পেয়ারা নিয়ে আসার পরে আমার ভাগ করে খেলাম। ফজরের নামাজের আজানের আগেই আমরা ওখান থেকে সরে পড়লাম। আবার নদীর মধ্যে ঢুকলাম।

গাইড হাফিজকে আমরা যমুনা নদীর পাড়ে নামিয়ে দিলাম যাতে সে হেঁটে গিয়ে সংবাদ দিতে পরে যে মুক্তিযোদ্ধারা নৌকায় আসছে। তীব্র স্রোতের কারণে আমরা ভুয়াপুর পৌঁছে যাই হাফিজের আগে। নদীর পাশে, সড়ক দিয়ে কিছু ছেলে কালো ফুলহাতা শার্ট ও প্যান্ট পরা অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে। তখন চিন্তা করলাম এগুলোই বুঝি রাজাকার। তারা আমাদেরকে হ্যান্ডস আপ করার জন্য বলল। কমান্ডার সাহেব বললেন, অস্ত্র যা আছে সবাই যার যার অস্ত্র হাতে নিয়ে সোজা দাঁড়াও। দাঁড়ায়ে আমরা ওদেরকে হ্যান্ডস আপ করার জন্য বললম। এ সময়ে হাফিজ এসে পৌঁছায়, ও বলল উনারা তো মুক্তিযোদ্ধা। তখন তারা সব অস্ত্র নামায়। রাতে ওখান থেকে এক দুই কিলোমিটার পশ্চিমে গোপীনদাসী ইউনিয়ন বোর্ডে নিয়ে যাওয়া হল আমাদেরকে। এখানে আমরা রাতে থাকলাম। পরের দিন থেকে অনেক সেচ্ছাসেবককে পাঠানো হয় আমাদের কাছে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে সাত তারিখের দিকে ভুয়াপুর, মাটিকাটার সিরাজকান্দি চরে হানাদার বাহিনীর দুইটা বিশাল কার্গো স্টিমার আর লঞ্চ এসে ভেড়ে। আমাদের সাথে ছিল আমজাদ ও মুজিবর, কমান্ডারের নির্দেশে মুজিবর জালি নিয়ে যায় মাছ মারতে আর আমজাদ যায় ঘাস কাটতে। পরের দিন পাকিস্তানি সৈন্যরা স্টিমার থেকে নৌকা দিয়ে পাড়ে নামে, নেমে এর ওর সাথে কথা বলে হাঁটাহাঁটি করে। আমজাদ ও মুজিবরের কাছে মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান চায়, ওরা বলছে আমরা চিনি না, দেখি নাই। পরে দুপুরের দিকে খাবারের সময় ওরা ইচ্ছা করেই পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে গেল রেকি করার প্ল্যান নিয়ে। সাক্সেসফুলি রেকি করে সমস্ত খবর নিয়ে ওরা এসে পড়ে। স্টিমারে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ছিল, যা ১৪ আগস্ট পাকিস্তান দিবসে সমস্ত বর্ডার এলাকা চেক দেওয়ার জন্য নেয়া হচ্ছিল। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল দুইটা লঞ্চ দুই দিকে যাচ্ছে। একটা গেল সিরাজগঞ্জের দিকে আরেকটা নগরবাড়ির দিকে। নগরবাড়ির দিকে যেটা যাচ্ছিল আমরা তাতে আক্রমণ করি। পরে আমরা ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণ টু-ইঞ্চ মর্টার বোমা উদ্ধার করেছিলাম।

এখান থেকে একটা স্কুল ঘরে গিয়ে আমরা রাত্রিযাপন করলাম। ভোর হতে না হতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা পারে উঠে পড়ে। পারে এসে চারটা এলএমজি চতুর্দিকে ফিট করে। গ্রামবাসীদের ধরে এনে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর কাছাকাছি এসে একটা জঙ্গলের ভিতরে অবস্থান নিলাম। অবস্থান নিলেও গ্রামবাসীর কথা ভেবে গুলি করতে পারছিলাম না। সন্ধ্যার সময় ভুয়াপুর গেলাম। কাদের সিদ্দিকী বললেন আমাদের টাংঙ্গাইল থ াকতে হবে। কিন্তু লুৎফুর রহমান মোদা ভাই বললেন, সরিষাবাড়ীতে অনেক রাজাকার আছে। তারা ওই এলাকার মানুষদের উপরে অনেক অত্যাচার করছে। আমরা সেখানে যাবো। সরিষাবাড়ী, জামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট আমাদের দখলে নিবো। রাত্রে আমাদের নৌকায় পাঠানো হল দুইটা গ্রুপ করে। একটা গ্রুপ সরিষাবাড়ী থেকে এক-দেড় কিলো মিটার উত্তরে বাউশি ব্রিজের কাছে আর আমদের ছয়জনের একটা গ্রুপ নিয়ে আসা হল কান্দারপাড়া বাজারে। এখানে রেল লাইনের স্লিপারের নিচে এন্টি ট্যাংক মাইন পাতা হল। শাটল ট্রেনগুলো গোলাবারুদ খাবার দাবার এগুলো নিয়ে এদিকে আসা যাওয়া করে, সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ওখানে অবস্থান করছিলাম।

অন্য টিম বাউশি ব্রিজ থেকে ব্যাক করে, আমরাও সকালে ফিরে এলাম। সন্ধ্যার সময় কথা হলো যে আগামী কালই অ্যাট্যাক করতে হবে। আমাদের পাঠানো হল কান্দারপাড়া বাজারের আশেপাশে পজিশন নেওয়ার জন্য। একদল গেল সরিষাবাড়ীতে। আলিয়া মাদ্রাসায় রাজাকার ক্যাম্পে। আরেক দল গেল বাউশি ব্রিজের ওখানে। আমরা পশ্চিমে রেললাইনের দিকে মুখ করে পজিশন নিয়েছি। আমাদের সাথে রাশিয়ান এলএমজি হাতে ছিল আমজাদ। আমরা ছয়জন তার আন্ডারে ছিলাম। আমার পাশেই অবস্থান নিয়েছিল বেলাল, তার ডান পাশে ইউনুস, তারপরে আমজাদ, হাবিব ভাই এবং জামাল এই ছয়জন। পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন সামনাসামনি এসে পড়ে তখন আমজাদ ফায়ার ওপেন করলে তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য রেল লাইনের উপর পড়ে যায়। বাকি সৈন্যরা লাইনের ঢালের মধ্যে কতগুলো গাছের আড়াল থেকে বুঝতে চেষ্টা করছিল গুলি কোন দিক থেকে আসছে। এ সময়ে বেলাল আর আমি ফায়ার করি। দুইজন মারা গেল, লাশগুলো রেললাইনের ঢাল গড়িয়ে নিচের দিকে আসে। ওরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে আমার রাইফেলের ম্যাগাজিনের বুলেট শেষ হয়ে গেছে। কোমরের গামছায় বুলেট ছিল। চার্জারসহ রাইফেলের উপর ম্যাগাজিন বসিয়ে বুলেট প্রেশার দিচ্ছি, হাতটা ওখানে রাখার সাথে সাথেই পাকিস্তানি বাহিনীর এলএমজির ফায়ার এসে আমার হাতে লাগে। মুহূর্তের মধ্যে হাড় মাংস সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। হাতে শুধু একটু চামড়া আর দুইটা রগ ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। আমি যতই হাত উঠানোর চেষ্টা করছি হাত আর উঠে না। এদিকে বেলালের বামপায়ে গুলি লাগলে চিৎকার দিয়ে পিছনে পড়ে যায়। আমরা দুজনে নিজেদের রক্তে একাকার হয়ে গেলাম। আমি কোমর থেকে গামছাটা খুললাম বা হাত দিয়ে ওই রগ আর সামান্য চামড়া গামছা দিয়ে মোড়ালাম। মুড়িয়ে দাঁতে কামড় দিয়ে কোনো রকমে দুইটা গিট দিলাম। যেখানে হাড়মাংস নাই সেটা কীভাবে আটকানো যায়। পরে রাইফেলের বেল্টের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে বাম হাতের কনুইয়ের উপর ভর করে ক্রলিং করে পাটক্ষেত পর্যন্ত গিয়েছি। কিছু দূর যাওয়ার পর আমি জ্ঞান হারাই। শিমুল গাছের নিচে আমার অর্ধমৃত লাশ পড়ে থাকে। ছয়টা পর্যন্ত আমার কোন জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফেরার পর আমি শুধু দেখছি কিন্তু কথা বলতে পারছিনা। ওরাও কেউ আমাকে কিছু বলছেনা। পরে ওরা কিছুদূর হেঁটে নৌকায় বাড়িতে পৌঁছায়।

পরে খবর আসে, পাশের গ্রামের বারেক মৌলবি আহত অবস্থায় পড়ে থাকা সহযোদ্ধা বেলালকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। এরপর বেলালকে তারা চ্যাঙদোলা করে রেললাইনের উপরে নিয়ে গিয়ে, বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মাথার খুলি উপড়ে ফেলেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমাকে বাঁচানোর জন্য নৌকা করে আরেকটি গ্রামের পিছনে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে আমার বড় ভাই আর আমাদের কোম্পানি কমান্ডার সুযোগ বুঝে এসে হাসপাতালে নিল। হাসপাতালে ব্যান্ডেজটা খুলল কিন্তু প্লাস্টার করল না। ব্যান্ডেজ করেই এক সপ্তাহের মতো রাখলো। কেটে ফেলতে হবে কিনা এই চিন্তা করতেই ওরা এক সপ্তাহের মতো রাখলো। পরে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিলো গৌহাটি আর্মির হাসপাতালে। গৌহাটিতে মাস দুয়েক রাখার পর পাঠালো পশ্চিমবঙ্গে ব্যারাকপুর হাসপাতালে। স্বাধীন হওয়ার আগে আমার হাতে আবার অপারেশন হলো। অপারেশন হওয়ার পরে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের দেখতে এসেছিলেন। বিজয়ের পর দেশে ফিরে আমাদের সহযোদ্ধা শহিদ বেলালের স্মরণে একটি শহিদ মিনার করি। যা একাত্তরের পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর বারেক মৌলবীর অপকর্ম মুছে দেবার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বর্তমানে ধর্মীয় স্থাপনা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে।

নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের মন্তব্য

প্রথমেই সাধুবাদ জানাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। বর্তমান ক্রান্তিকালে এই জাদুঘর বার্তা আমাদের জন্য মূর্ত আলোকবর্তিকা। মহতী এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক এই কামনায়।

ফিরোজ হায়দার
সহকারি শিক্ষক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক
ভূরুঙ্গামারী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

প্রতি মাসের পনের তারিখের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকি। জাদুঘর বার্তাটি আমাদের সকলের হাতে সময়মত পৌঁছানোর এই দায়িত্বও সুচারুভাবে করে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় মানুষ রঞ্জন কুমার সিংহ দাদা। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত সব সংখ্যা যথা সময়ে আমাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে আমরাও জানাতে পারছি মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সবার মঙ্গল কামনায়।

রূপা চাকমা
সহকারি শিক্ষক
রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি

কোনটি রেখে কোন সংখ্যার কথা বলব। এক কথায় অসাধারণ। মহতী এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানাই।

রামপ্রসাদ রায়
সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা)
আড়পাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শালিখা, মাগুরা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর মুখপত্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অনলাইনে ও কাগজে ছাপা আকারে যা মুক্তিযুদ্ধকে আরো জীবন্তভাবে উপস্থাপন করছে। লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ ও পদক্ষেপ গণপাঠাগারে পত্রিকা পেয়ে আসছে জন্মলগ্ন থেকে। শ্রদ্ধেয় রঞ্জন কুমার সিংহ অনলাইনে ও কুরিয়ারে পত্রিকাটি যথাসময়ে পাঠান যার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষায় থাকি। এ কাগজের প্রতিটি সংখ্যা অত্যন্ত যত্নসহকারে বর্ণবিন্যাস ও শৈল্পিকভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে পাঠকের রুচিবোধ উজ্জীবিত হয়। লেখা ও ছবিগুলো পাঠকের চেতনায় অনুরণিত হয় মুক্তির প্রেরণায়। আমি চাই এই পত্রিকাটি প্রান্তিক পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধ ও অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ আর বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তাসহ নানা স্থাপনার নামকরণের দাবী সরকারের কাছে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হোক।

মাজহারুল ইসলাম রুবেল
সহকারি অধ্যাপক
লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ, লংলা, কুলাউড়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল কাজের মধ্যে অন্যতম একটি ই-নিউজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো এবং তা ছড়িয়ে দেবার জন্য অনবদ্য ভূমিকা রাখছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা। আমাদের না জানা দেশ বিদেশের অনেক সুহৃদ, সংগঠন-সংস্থা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন নতুন কর্মসূচি ই-নিউজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার মাধ্যমে আমরাসহ নতুন প্রজন্ম জানতে পারছি। এই জাদুঘর বার্তা একটি অসাধারণ সৃ জনশীল সৃষ্টি। সম্ভব হলে প্রিন্ট করে প্রকাশ করা যায় কি না তা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকুক, নতুন প্রজন্ম অনেক অজানা তথ্য জানতে পারছে। প্রতিটি সংখ্যাই আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

মোঃ গোলাম ফারুক মিথুন
সহকারী অধ্যাপক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক
নামোশংকরবাটী কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এমন মহতি উদ্যোগের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এমন মেইল পাঠালে প্রিন্ট করে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবো ইনশা আল্লাহ।

আল মাহমুদ
কম্পিউটার শিক্ষক
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা
শেরপুর সদর

শুভেচ্ছা নিবেন। ভাষার মাসে সকল ভাষা শহিদদের স্মরণ করি। এছাড়া শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টিগণকে, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সেই জাদুঘরের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের বদৌলতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলার শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে এবং সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। জাদুঘরের পরবর্তী কার্যক্রমের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' প্রকাশিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও সেইসব অঞ্চলের জাদুঘর কর্তৃক কার্যক্রম এবং জাদুঘরের বিভিন্ন পরিবেশনাগুলো জানতে পারছি ও উপকৃত হচ্ছি। 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' নিয়মিত প্রকাশের জন্য শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টিগণসহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র দীর্ঘ পথচলা কামনা করি।

মোহাঃ মোস্তাক হোসেন
নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক
আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রকাশিত জাদুঘর বার্তাটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এই বার্তার মাধ্যমে আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য ও ইতিহাস জানতে পারছে। এছাড়া সুশীল সমাজের ব্যাক্তিদের চিন্তা-চেতনা ও ধারক-বাহকদের অভিব্যাক্তিগুলো পেয়ে আমরাও সমৃদ্ধ হচ্ছি। আমি নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসাবে সম্পৃক্ত থ াকায় আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বার্তার মাধ্যমে জানতে পারছে। পাশাপাশি আমার গার্লস গাইড এসোসিয়েশন, গাইড ও রেঞ্জাররা এই বার্তাটি পড়ে সমৃদ্ধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং শিক্ষার আলো ডটকম পরিবারের সকলে এই বার্তাটি পড়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাই আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই মহতি উদ্যোগের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মাধুরী মজুমদার
সহকারি শিক্ষক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক
হাফিজা খাতুন মিউনিসিপাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
মৌলভীবাজার

জনাব আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রকাশিত নিউজ লেটার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি মাসে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে আমারা জাদুঘরের কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাতে পারছি। প্রকাশিত জাদুঘর বার্তাটি বর্তমানে সময় উপযোগী। এই নিউজ লেটারটি অনলাইন ও অফলাইনে ব্যাপকভাবে সংবাদ পত্রের মতো প্রকাশ করা যায় কি না বিষয়টি আপনাদের সদয় বিবেচনায় আনবেন। পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করছি।

হারুন অর রশিদ
নেটওয়ার্ক শিক্ষক
ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী

ইতিহাসের এই মাসে

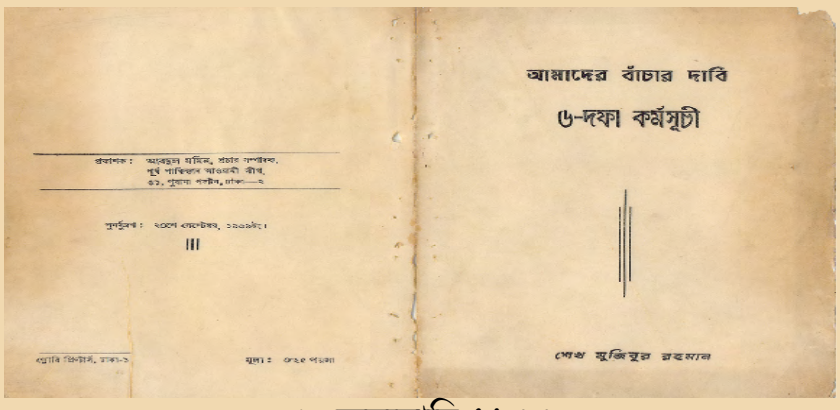

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপিত

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলন আহ্বান করে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ। ২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত হলো পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি তুলে ধরতে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে যাবেন। যে দাবিসমূহ উত্থাপিত হবে তা নির্ধারণে মতিঝিলের আলফা ইন্স্যুরেন্স কার্যালয়ে বসে শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তুত করলেন ছয়দফা দাবিপত্র। ৪ ফেব্রুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদ ও নুরুল ইসলাম চৌধুরীসহ শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর পৌঁছালেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে মুসলিম লীগ সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজলের নেতৃত্বে সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে ছয় দফা দাবি পেশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমস্ত বিরোধী দলগুলো ছয়দফা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরদিন সংবাদপত্রে ছয়দফা বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয় মুজিব পাকিস্তানের দুই অংশ আলাদা করতে চায়। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতিনিধি দলসহ সম্মেলন বর্জন করেন। বঙ্গবন্ধুর পেশকৃত এই ছয়দফা বাঙালির মুক্তির স্পৃহাকে সংহত করে। ছয় দফা বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংগ্রামে 'মুক্তির সনদ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২১ ফব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় ছয় দফা অনুমোদিত হয়।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ থেকে ১০ তারিখ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই সম্মেলন উপলক্ষে টাঙ্গাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত গান্ধী, তিতুমীর, শেক্সপিয়র, লেনিন, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, সুভাষ বোস, বিধান রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী প্রমুখের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবের বিপরীতে পূর্ব বাংলার উদার, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী বৈশিষ্ট ফুঁটে ওঠে। পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক সম্মেলন হিসেবে আয়োজিত হলেও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে ভিন্ন মাত্রায় উচ্চারিত হলো বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবি। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্মেলন মঞ্চে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন অবিলম্বে পূর্ব অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন আদায় না হলে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে। তৎকালীন রাজনৈতিক মহল ও পত্র-পত্রিকায় এই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়- 'পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়'। তবে সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল এই সম্মেলন।

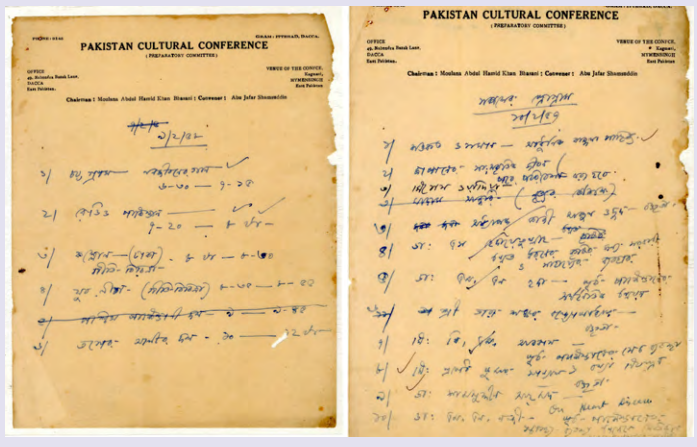

কাগমারী সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্টানসূচি

মানবিক নীতিমালা প্রদর্শনীর অংশ

মানবতার উদাহরণ তৈরি করেছিল বাঙালিরা

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’- বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সংস্কৃতি, সেই মানবিক বাঙালির মূলমন্ত্র কবি চণ্ডীদাসের কথায় প্রকাশ পেয়েছিল। ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদের উর্ধ্বে মানুষ প্রাধান্য পায় এদেশের মানুষের কাছে। এমনকি সেই মানুষ যদি হয় শত্রুপক্ষের তখনও মানবতা থেমে থাকে না। এমন উদাহরণ তৈরি করেছিলেন ১৯৭২ সালে কুমিল্লা অঞ্চলের জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা। সেই অঞ্চলে আটকে পড়া পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিকদের আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহায়তায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থাপিত নিরাপদ আশ্রয় শিবিরে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছিলেন বাঙালি জনগণ। একজন বাঙালি প্রধান শিক্ষক তার স্কুলে কয়েকদিন তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তাদের ওপর যেন কোন হামলা না হয় সেটি নিশ্চিত করতে স্কুলটি পাহারা দিতেন মুক্তিযোদ্ধারা, যারা কয়েকদিন আগেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন। এই অসামান্য মানবতার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে। যেখানে বলা হয়েছিল ‘Bengali assistants are playing key roles in helping the international red cross to take stranded West Pakistanis overnight to the safety of special camps in Dacca and Chittagong from this eastern Bangladesh town.’ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত এই সংবাদ ভাষ্যটি প্রদর্শিত হচ্ছে ‘মানবিক নীতিমালা : এখানে এবং এখন’ শীর্ষক চলমান বিশেষ প্রদর্শনীতে। বাঙালি যেন ভুলে না যায় তার এই গৌরবের ইতিহাস। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রবাহিত হোক মানবিকতা।

Washington Post, Friday Feb 4.

Bengalis Overcome Hatred, Help Pakistani Refugees

By Fred Bridgeland
Reuter

COMILLA, Bangladesh, Feb. 3 — A few Bengalis in the new state of Bangladesh are still prepared to help West Pakistanis to safety despite the hatred that has convulsed the region during the past year.

Bengali assistants are playing key roles in helping the International Red Cross to take stranded West Pakistanis overnight to the safety of special camps in Dacca and Chittagong from this eastern Bangladesh town.

One Red Cross worker, a young Frenchman named Jean-Pierre Gontart, invited me this week to join him on one of his 100-mile night runs from Comilla to Chattagong.

His charges were a West Pakistani who had lived in East Bengal for eight years —five of them in prison on conviction for manslaughter —a factory watchman who lived here for 20 years with his Bengali wife and three young daughters, and a Bengali woman and her five-month-old child anxious to join her husband in the West.

They had all been given shelter for several nights in a local school by its Bengali headmaster. Armed Mukti Bahini guerrillas, who had been fighting the Pakistani army even before the brief but fierce India-Pakistan war last month, still patrol Comilla and its environs, and are constantly vigilant for stragglers.

One of them, armed with a rifle, told me near the refugee reception center that he was just going on night patrol to hunt down an alleged looter.

Beautiful Bodyguards

Gontart said there had been harassment by guerrillas at some of the eight Red Cross centers he worked for, and one center had to be transferred to another town. He declined to give any further details, but added that he made his runs at night to minimize the danger for his passengers.

When I asked what precautions he made against possible incidents on the way, he replied, “I carry bodyguards.” The bodyguards turned out to be two beautiful teenaged Bengali students, Nashima and Shalina, who handed out Jasmine flowers to everybody.

Gontart placed his flowers between his lips and sat in the front of the station wagon with the girls and the Bengali driver. The Bengali's job was to persuade inquisitive persons on the way to Chittagong that the trip was a normal Red Cross supply run.

Only that day, I had been stopped on the road from Dacca to Comilla by Mukti Bahini demanding money for food and clothing.

We left Comilla at 9:30 p.m. and took care not to stop in the main towns. The road passed shattered Indian tanks blown up in Pakistani minefields, burned-out villages along the Bangladesh border with India and Pakistani army trucks shot up by Indian planes.

Slaughter House

We also crossed several dried-up river beds where concrete bridges had been blown up either by the Mukti Bahini or the retreating Pakistani Army.

At 3:30 a.m., we entered the steep-sided Tiger Pass north of Chittagong and presently drew up at the Hotel Agrabad, a Red Cross neutral zone during the recent war where 4,000 civilians took shelter. Bengalis say that the nearby Chittagong Circuit House, a handsome British-built structure, was turned by Pakistani soldiers into a human torture and slaughter house.

At 8:20 a.m., our passengers were handed over to a Chittagong Red Cross representative to be taken to a special camp for West Pakistani civilians near Chittagong.

A Red Cross source said the chances of the 1,000 camp residents reaching home were “good.”

Unconfirmed reports said there were 3,000 West Pakistanis in a similar camp near Dacca, but that several thousand others had already been flown out of Bangladesh to Lucknow in India.

Kudrat Kahn, our convict passenger, aged 32, said on arrival at Chittagong: “At home, I will tell people there was a European and a few Bengalis who brought me to safety, and I will pray for them.”

দশম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২২

LIBERATION DOCFEST BANGLADESH
11-15 March, 2022

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব’-এর দশম আয়োজন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১১ থেকে ১৫ মার্চ। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে এ বছর এ আয়োজনটি আংশিক সরাসরি আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবটি ২০০৬ থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বছরের আয়োজনে ইতোমধ্যেই একুশ শতাধিক ছবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জমা হয়েছিল। জমাকৃত ছবির মধ্য থেকে দেড়শতাধিক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিদিন চারটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনেও নির্বাচিত ছবিসমূহ প্রতিদিন স্ট্রিমিং করা হবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে অনলাইনে আয়োজিত উৎসবের পার্টনার হিসেবে কসমস ফাউন্ডেশন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছিল। এ বছরের আয়োজনেও কসমস ফাউন্ডেশন একই ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।

পাঁচ দিনের উৎসবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাগে ছবি প্রতিযোগিতা হবে। বাংলাদেশি অনধিক এক ঘণ্টার প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এ বছর বিচারক হিসেবে থাকছেন- জার্মান প্রবাসী প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহিন দিল রিয়াজ আহমেদ, শিল্পী ও শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামান এবং অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা। অনধিক এক ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য তিনজন বিচারক থাকছেন পাকিস্তানি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা আম্মার আজিজ, নিউজিল্যান্ডের ডকএজ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের পরিচালক এলেক্স লি এবং বিলাতের শীর্ষস্থানীয় প্রামাণ্যচিত্র উৎসব শেফিল্ড ডকফেস্টের মিতা সুরি। করোনা পরিস্থিতির কারণে জুরিরা ছবি বিচারের দায়িত্ব অনলাইনে পালন করবেন। উৎসবের শেষ দিন ১৫ মার্চ বিকেলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রামাণ্যচিত্র দুটোর নাম ঘোষণা করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের ছবির জন্য এক লাখ টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

পাঁচ দিনের এ উৎসবে অনলাইনে টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি শো ২০ টাকা হিসেবে একজন দর্শক দেড়ঘণ্টার একটি প্রদর্শনী দেখতে পারবেন। পাশাপাশি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষার্থী, সংবাদকর্মীদের জন্য অনলাইনে এক্রিডিটেশনের মাধ্যমে ছবি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উৎসবের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণ ও উঠতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালা ও এর মধ্য দিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। গেল দুই বছর করোনার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কারণে এই কর্মশালা অনলাইনে আয়োজিত হয়েছিল। তবে এ বছর কর্মশালাটি আংশিক অনলাইনে আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উৎসব পরবর্তী সময়ে আগামী ২৫-২৮ মার্চ পনের জন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার ফিল্ম প্রজেক্ট নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ১ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই পনেরজন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার প্রজেক্টসমূহের পিচিং অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচিত এই প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্পগুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি ছবি নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

একুশের স্মারক

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে

ঐতিহাসিক ২১ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ও ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সাধারন হরতাল পালন করিতে যাইয়া জালেম মুসলিম লীগ সরকারের গুলিতে শহীদ হয়েছেন যাঁরা—

২১ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার

* ১০ জন তরুন প্রাণ দিয়াছেন
* ২ জন মহিলা সহ ৭১ জন আহত হইয়াছেন
* ২০ জন নারী সহ ৮২ জন কারারুদ্ধ ও সরকারের ঘৃন্য কালাকানুন কবলিত

পূর্ব্ববঙ্গের সাড়ে চারি কোটি জনগনের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ২১ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারন এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে একত্রিত হন। পুলিশ উক্ত জন সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে এবং ছত্রভঙ্গ জনতার উপর নির্মমভাবে লাঠি ও বেয়নেট চার্জ্জ করে। ঐদিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল কম্পাউণ্ডেও অনুরূপভাবে ছাত্র ও জন সমাবেশ হইতে থাকে। পুলিশ উক্ত সমাবেশের উপর কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালানোর পর হঠাৎ নির্বিচারে গুলীবর্ষন করিতে থাকে। ফলে ঘটনাস্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন নিহত হন এবং গুলির আঘাতে তাহার মাথার খুলি উড়িয়া যায়। এবং অনেকে গুরুতররূপে আহত হন। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার অল্পক্ষন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার, আবদুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদের মৃত্যু হয় (ইন্নালিলাহে...............রাজেউন)

যে সমস্ত কর্ম্মবীর বৃহস্পতিবার রাত্র বারটার পূর্ব্বে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তাহাদের মৃতদেহ ফেরৎ লইবার জন্য আপ্রান চেষ্টা করা হয়। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এই যে [redacted] কুখ্যাত নুরুল আমীন সরকারের আদেশে উক্ত মৃতদেহগুলি পুলিশ কর্ত্তৃক গভীর রাত্রে বিনাকাফনে ও বিনাজানাজায় আজিমপুর গোরস্থানে পুতিয়া ফেলা হয়। এতদ্ব্যতীত পুলিশ যে ছয়টী মৃতদেহ পূর্ব্বাহ্নেই সরাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার কোন সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। উল্লেখযোগ্য যে ঐ ছয়টী শবদেহের মধ্যে তিনটি কিশোর বালকের মৃতদেহও রহিয়াছে।

২২ শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—

* ২০ জন নিহত
* শতাধিক আহত

আজ শুক্রবার দশটার সময় সমস্ত ঢাকা, মফস্বল ও নিকটস্থ অন্যান্য জিলা হইতে প্রায় চার লক্ষ লোক মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে গতকল্যকার গুলীতে নিহত শহীদদের গায়েবানে জানাজা পাঠ করেন। অতঃপর উক্তস্থান হইতে সমবেত জনতার এক বিরাট শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ঢাকার প্রধান রাজপথগুলি প্রদক্ষিন করার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। শোভাযাত্রাটি হাইকোর্টের পূর্ব্বদক্ষিন কোনে আসিয়া পৌছিলেই পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে বালক-কিশোর-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে শোভাযাত্রার উপর লাঠি ও বেয়নেট চার্জ্জ করে। লাঠি ও বেয়নেটের আঘাতে শত শত আহত ছাত্র ও জন সাধারন এদিক-ওদিক ছুটাছুটী করিতে থাকাকালীন আবার নির্ব্বিচারে মুহুর্মুহু গুলীবর্ষন আরম্ভ হয়। ফলে ঘটনাস্থলেই একজন নয়-বৎসরের শিশুসমেত ২০ জন নিহত হয় এবং ঘটনাস্থলেই গুরুতররূপে আহত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তারিত করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে অনেককেই বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু-প্রতিক্ষা করিতে দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত যে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রকর্ম্মীকে ঢাকা সেনট্রাল জেলে আটক রাখা হয় তাহাদের জন্য আজ পর্য্যন্তও কোন আহার সরকার হইতে সরবরাহ করা হয় নাই। ফ্যাসিস্ট নুরুল আমীন সরকার এইরূপে জাগ্রত ও সংগ্রামী ছাত্রকর্ম্মীদের বিনা আহারে তিলে তিলে হত্যা করার এক ঘৃন্য অপপ্রচেষ্টায় রত হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের জাগ্রত ছাত্রসমাজ এবং সংগ্রামী জনসাধারনের কাছে আমাদের আহ্বান—আপনারা প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি থানায় এবং প্রতিটি পল্লাতে পল্লীতে এবং ঢাকা সহরের সর্ব্বত্র স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকানপাট ও যানবাহন বন্ধ করিয়া বাংলা ভাষার দাবীকে জোরদার করে তুলুন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষনা করুন যতদিন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করা না হয় ততদিন এই সংগ্রামের বিরাম নেই।

পূর্ব্ববঙ্গের সাড়ে চারকোটী মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবীতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন এবং মোনজাত করুন যেন কোটী কোটী মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেবার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অপ্রিয় সরকারের অবিলম্বে পতন ঘটে।

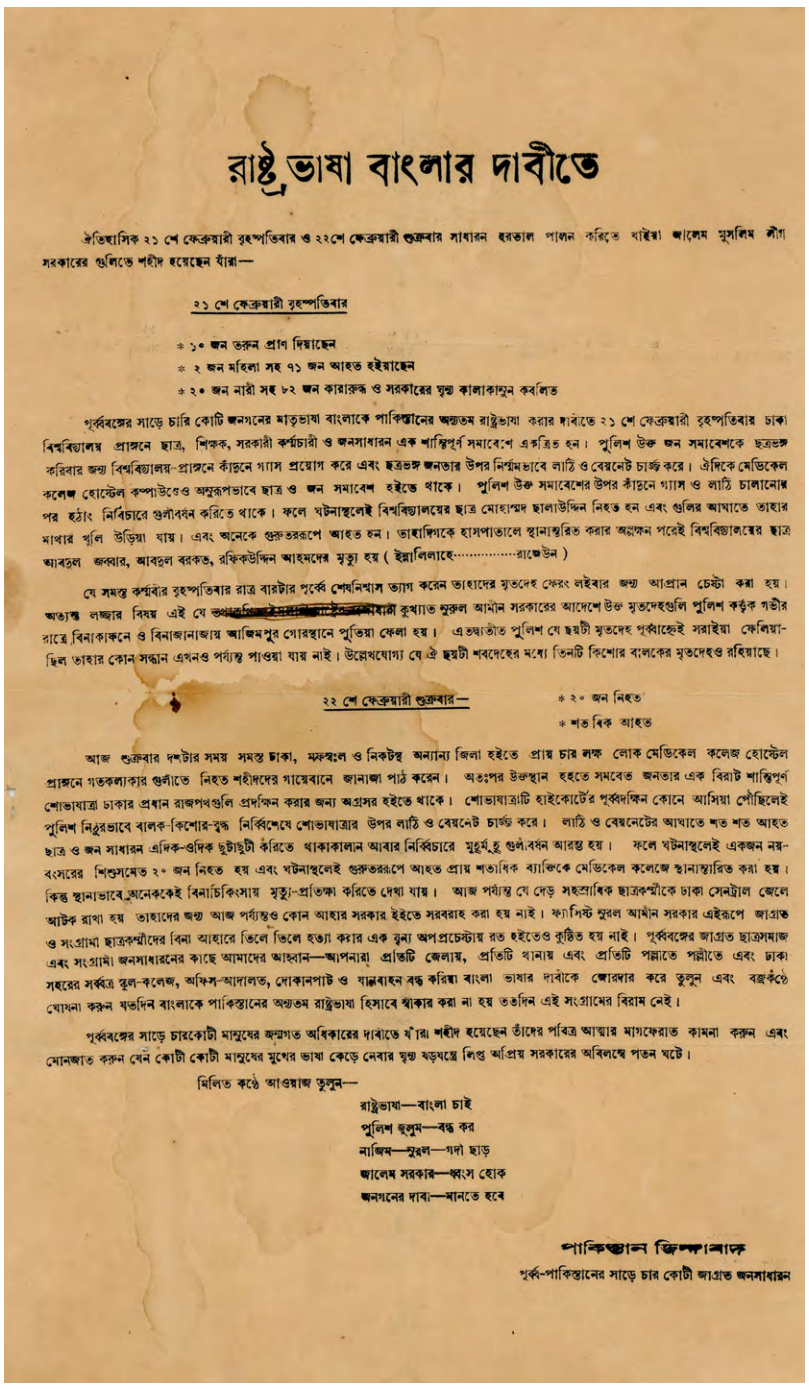

মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন—

রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই
পুলিশ জুলুম—বন্ধ কর
নাজিম—নুরুল—গদী ছাড়
জালেম সরকার—ধ্বংস হোক
জনগনের দাবী—মানতে হবে

পাকিস্তান জিন্দাবাদ
পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটী জাগ্রত জনসাধারন

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির মিছিলে গুলিবর্ষণের বিবরণ সম্বলিত লিফলেট

দাতা: সৈয়দ মো. হুমায়ুন কবির

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official